MONTHLY VANGUARD
ভ্যানগার্ড
www.spb.org.bd
বাংলাদেশের সমাজতান্ত্রিক দল-বাসদ এর মুখপত্র
রেজি. নং ডিএ ১৩২৬ : ২১তম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা
এপ্রিল-মে ২০২৩
দাম : দশ টাকা

# সংবিধানের দোহাই দিয়ে
# নিরপেক্ষ নির্বাচনের দাবি উপেক্ষা করা চলবে না

রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ছে। বড় বড় সমাবেশ হচ্ছে এবং সেসব সমাবেশে উত্তাপ বাড়ছে নেতাদের বক্তৃতায়। বিরোধী দলসমূহের আন্দোলনের হুঙ্কার আর ক্ষমতাসীন দল কর্তৃক নির্বাচনের হাওয়া তোলার চেষ্টা, দুটোই চলছে রাজনীতিতে। প্রতি পাঁচ বছর পর নির্বাচন হবে, নির্বাচনের এই সময়-সীমা মানলে আর রাজনৈতিক পরিস্থিতি স্বাভাবিক থাকলে ২০২৩ এর শেষে বা ২০২৪ সালের জানুয়ারিতে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের বাধ্যবাধকতা আছে। সে হিসেবে নির্বাচনের আগে আগামী ৮-৯ মাস রাজনীতিতে একটা চরম উত্তেজনার সময়। বাংলাদেশের জনগণ নির্বাচনপ্রিয় বলে সবাই মানেন। কিন্তু নির্বাচন নিয়ে এখন তৈরি হয়েছে সংশয় এবং অনাস্থা। আগামী নির্বাচনেও সকল দল কি অংশ নেবে, নির্বাচন কি প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক হবে? এই প্রশ্ন যেমন আছে অতীতের উদাহরণ দেখে সংশয় তেমনি আছে। স্বাধীনতার ৫২ বছর পার হয়ে গেলেও দেশের নির্বাচন নিয়ে যত বিতর্ক হয় তার বেশিরভাগ অংশ জুড়েই থাকে নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে কিনা এবং নির্বাচন সুষ্ঠু হবে কিনা।

ইতিমধ্যে ভোটার তালিকা হালনাগাদ করেছে নির্বাচন কমিশন। নতুন করে তালিকায় যুক্ত হয়েছে ৮০ লাখ ৭৩ হাজার ৫৫৯ নতুন ভোটার। দেশে এখন মোট ভোটারের সংখ্যা ১১ কোটি ৯১ লাখ ৫১ হাজার ৪৪০ জন। এবার ভোটার তালিকা হালনাগাদে ভোটার সংখ্যা বৃদ্ধির হার ৫.১৮ শতাংশ। ভোটার সংখ্যা বাড়লেও কিন্তু ভোটের প্রতি আগ্রহ বাড়ছে না ভোটারদের। সর্বশেষ জাতীয় সংসদের ৬টি উপনির্বাচনে ভোট প্রদানের হার ৩০ শতাংশ। নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে নির্বাচন প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ না হওয়ায় ভোটার উপস্থিতি বাড়ছে না। সরল স্বীকারোক্তি কিন্তু কারণটা কী? একটা নির্বাচনপ্রিয় দেশে ভোটার উপস্থিতি কমে যাওয়া, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করা, নির্বাচন কমিশনের প্রতি আস্থা হারানোর কারণ খুঁজে বের করাটা জরুরি।

প্রতিবার নির্বাচন আসে আর সরকারি দল এবং বিরোধী দলের মধ্যে মূল বিরোধ লেগে যায় নির্বাচনকালীন সরকারব্যবস্থা কেমন হবে তা নিয়ে। ক্ষমতায় থেকেই নির্বাচন করতে চায় ক্ষমতাসীনরা এবার তেমনই চাইছে আওয়ামী লীগ এবং তাদের চাওয়ার স্বপক্ষে যুক্তি ভারী করার জন্য সংবিধান 'রক্ষার' শপথ নেয়া হচ্ছে। এমনও বলছেন যে সংবিধান থেকে একচুলও নড়বেন না তাঁরা। অপর দিকে বিরোধী দল দাবি করছে প্রয়োজন হলে সংবিধান সংশোধন করে নির্দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে হবে। অতীতের নির্বাচনের শিক্ষা থেকে তাঁরা বলছেন দলীয় সরকারের অধীনে কোনোভাবেই নির্বাচনে যাবে না, আলোচনা এবং বিতর্কে প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়াচ্ছে সংবিধান। বক্তব্য বিবৃতি আর উত্তেজনাপূর্ণ বক্তৃতা শুনে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, সংবিধানই এখন সকলের অংশগ্রহণে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য প্রধান আলোচ্য বিষয় বা গ্রহণযোগ্য নির্বাচনের প্রধান বাধা।

সংবিধানকে বলা হয় কোন দেশের সর্বোচ্চ এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আইন। রাষ্ট্রে নানা ধরনের অনেক আইন থাকতে পারে। যেমন যে আইন পার্লামেন্টে প্রণীত হয় তাকে বলে অ্যাক্ট বা আইন। যেমন বিশেষ ক্ষমতা আইন ১৯৭৪, শ্রম আইন ২০০৬, তথ্য অধিকার আইন ২০১০। সাধারণত সংসদেই আইন পাশ করা হয়, তবে সংসদ না থাকলেও যদি আইনের প্রয়োজন হয়, তাহলে সংসদের অবর্তমানে বা সংসদ অধিবেশনরত অবস্থায় না থাকলে রাষ্ট্রপতি যে আইন প্রণয়ন করতে পারেন তাকে বলা হয় অধ্যাদেশ বা ইংরেজিতে অর্ডিন্যান্স। তবে সংবিধানের অবস্থান অন্য যে কোন আইনের চেয়ে উচ্চতর অবস্থানে, যে কারণে সংবিধান হচ্ছে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন। সংবিধানকে রাষ্ট্রের আইনগত ভিত্তি বা রাষ্ট্র গঠনকারী দলিলও বলা হয়ে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে শাসন ক্ষমতায় যারা থাকেন তাঁরা সবসময় সংবিধানকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার্য দলিল বলেই মনে করেন।

সামরিক শাসন বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনে যে প্রশ্নে সব আন্দোলনকারী রাজনৈতিক দল একমত হয়েছিলেন তা হলো নির্বাচনটা নিরপেক্ষ হতে হবে। নির্বাচিত দাবি করা সামরিক শাসক ক্ষমতা ছেড়ে দিলে শাসনতান্ত্রিক শূন্যতা তৈরি হবে একথা বলে ক্ষমতা ছাড়তে গড়িমসি করার কালে পথ বের করা হয়েছিল তত্ত্বাবধায়ক সরকার করার। সেই সরকারের অধীনে নির্বাচন হলো কিন্তু তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে বিতর্কের শেষ হলো না। সামরিক সরকার পরবর্তী বিএনপি সরকারের অধীনে নির্বাচন সুষ্ঠু হবে না এই আশঙ্কায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে বিএনপি প্রথমে সংবিধানের দোহাই দিয়ে সে দাবি প্রত্যাখ্যান করে বলেছিল, এটি সংবিধানে নেই। ইতিহাসের পথ পরিক্রমায় এখন বিএনপির এ দাবির পরিপ্রেক্ষিতে এখন আওয়ামী লীগ বলছে, এটি সংবিধানে নেই। তাঁরা এটুকু বলেই কিন্তু ক্ষান্ত হচ্ছে না, বরং আগ বাড়িয়ে আরও বলছে যে, সংবিধান থেকে একচুলও তারা নড়বে না। যারা ক্ষমতায় থাকে তাদের সংবিধান রক্ষা করার এই যে তাগিদ তার ফলে সাধারণ মানুষের মনে স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগতে পারে তাঁরা কি আসলেই সংবিধান রক্ষা

করতে চান নাকি ক্ষমতা রক্ষায় ঢাল হিসেবে সংবিধানকে ব্যবহার করতে চান? কারণ জনগণের সংবিধানসম্মত অধিকারের প্রশ্নে তাঁরা তো এত সোচ্চার হয়ে উঠছেন না বা পদক্ষেপ নিচ্ছেন না।

জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের ফলে বাংলাদেশের জন্ম। ৫২, ৬২, ৬৬ ও ৬৯-এর আন্দোলন পরবর্তীতে '৭০-এর নির্বাচন এক্ষেত্রে এক মাইল ফলকের মতো কাজ করলেও স্বাধীনতার পর থেকেই সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যাপারে ক্ষমতাসীনরা বরাবরই অনাগ্রহ দেখিয়ে আসছে। মাগুরা উপনির্বাচনকে নিয়ে ব্যাপক বিতর্কের পর আওয়ামী লীগ তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচনের দাবিতে। তাঁরা আন্দোলন, নির্বাচন বর্জনের মধ্য দিয়ে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবি মেনে নিতে তৎকালীন সরকারকে বাধ্য করে। যেহেতু সংবিধানে ছিল না তাই সংবিধানের অসামঞ্জস্য দূরীকরণের লক্ষ্যে ১৯৯৬ সালে ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংবিধানে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয়। ফলে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা ছিল একটি রাজনৈতিক সমঝোতার ফল। এর ফলে আশা করা হয়েছিল শুধু নির্বাচন সুষ্ঠু হবে তাই নয় সমস্ত রাজনৈতিক দল যেন নির্বাচনে অংশ নিয়ে একটি গ্রহণযোগ্য নির্বাচনী পরিবেশ গড়ে উঠবে।

কিন্তু আশা স্থায়ী হলো না। রাজনৈতিক সমঝোতার উপর ধাক্কা এলো ২০০৪ সালে, বিএনপি সরকারের আমলে, সংবিধানের চতুর্দশ সংশোধনী এলো। এর মাধ্যমে বিচারপতিদের অবসরের বয়সসীমা উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে বাড়িয়ে দেওয়া হলো, যা সন্দেহের উদ্রেক করলো রাজনৈতিক মহলে। দ্বিতীয় ধাক্কা আসে ২০১২ সালের ১৬ সেপ্টেম্বর উচ্চ আদালত কর্তৃক তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থাকে ভবিষ্যতের জন্য অসাংবিধানিক ঘোষণা করে প্রদত্ত রায়ের পর। আদেশে প্রধান বিচারপতি এ বি এম খায়রুল হক 'প্রসপেকটেভলি' বা ভবিষ্যতের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থাকে অসাংবিধানিক ঘোষণা করেন, যদিও এর আগে হাইকোর্টের দুটি বেঞ্চ ত্রয়োদশ সংশোধনীকে সংবিধানসম্মত বলে রায় দিয়েছিলেন।

তবে এর আগেই 'মেজরিটারিয়ান পদ্ধতিতে' বা সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে, আপিল বিভাগের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের প্রায় ১৫ মাস আগে, ২০১১ সালের ৩০ জুন তারিখে ১৯৯৬ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রসঙ্গে যে বিধান ছিল তা বাতিল করা হয়। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী একতরফাভাবে পাসের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার এই কাজ করে। সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ১৯৯৬ সালের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাতিল করে দলীয় সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের বাধ্যবাধকতা সৃষ্টির কারণে এবং পরবর্তীতে সর্বস্তরে যে সর্বগ্রাসী দলীয়করণ হয়েছে, তার ফলে শুধু নির্বাচনীব্যবস্থা নয় প্রশাসন ব্যবস্থাও আস্থা হারিয়েছে। একথা উল্লেখ করতে হয় যে সংবিধানের পঞ্চদশ সংশোধনী পাস করা হয়েছে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা রাখার পক্ষে বিশেষ সংসদীয় কমিটির সর্বসম্মত সুপারিশ উপেক্ষা করে, আদালতের সংক্ষিপ্ত আদেশের একটি ব্যাখ্যার ভিত্তিতে (যে ব্যাখ্যা নিয়ে বিতর্ক এখনও চলছে) এবং আদালতের পূর্ণাঙ্গ রায় প্রকাশের প্রায় ১৫ মাস আগে। এর পর অনুষ্ঠিত ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের দুটি সংসদ নির্বাচন দেশের রাজনীতিতে এক অমোচনীয় কলঙ্কের কালির দাগ রেখে গেছে।

এ রকম এক পরিস্থিতিতে যখন দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন কড়া নাড়ছে তখন দেশের নির্বাচন পদ্ধতি, নির্বাচনকালীন সরকার, প্রশাসন ও পুলিশের ভূমিকা এবং নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার সবকিছু নিয়েই সন্দেহ ও অবিশ্বাস দানা বেঁধে উঠেছে। ফলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাভিত্তিক নির্বাচন কী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মতামত ধারণ করে? এই প্রশ্ন জোরেশোরে উঠছে। বিষয়টা একটু বিশ্লেষণ করে দেখা যাক। বাংলাদেশে এ যাবতকালে অনুষ্ঠিত এগারোটি জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মধ্যে চারটি নির্বাচনকে আপাত গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচনা করা হয়। সেই নির্বাচনগুলো যেমন–১৯৯১, ১৯৯৬ (জুন), ২০০১ ও ২০০৮ সালের নির্বাচনের ফলাফল বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক দলের প্রাপ্ত ভোট, আসন এবং ক্ষমতায় যাওয়ার মধ্যে একটা বড় ধরনের অসামঞ্জস্য লক্ষ্য করা যায়। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে সরকার গঠনকারি দল বিএনপির প্রাপ্ত ভোট ৩০.৮১ শতাংশ এবং আসন সংখ্যা ১৪০ আর আওয়ামী লীগের প্রাপ্ত ভোট ৩০.০৮ শতাংশ আর আসন ছিল ৮৮। ২০০৮ সালে আওয়ামী লীগ ৪৮.৯০ শতাংশ ভোট পেয়ে ২৩০ আসন আর বিএনপি ৩৭.২০ শতাংশ ভোট পেয়ে আসন পায় ৩২। তাহলে দেখা যাচ্ছে এই পদ্ধতিতে ভোটের সংখ্যা ও ভোটের হার নয় কতটা আসনে বিজয়ী হলো এটাই প্রধান বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। এক ভোটেও যদি কোন প্রার্থী বিজয়ী হন তাহলে বিপক্ষ প্রার্থীর প্রাপ্ত ভোটের কোন মূল্যই থাকে না। সে কারণেই নির্দিষ্ট আসনে বিজয়ী হবার জন্য প্রার্থীরা যে কোন পথ অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। ফলশ্রুতিতে দেশ শাসিত হয় সংখ্যালঘিষ্ঠ দ্বারা।

নির্বাচনী ব্যবস্থার এই দুর্বলতা সংশোধনের জন্য বামপন্থি দলসমূহসহ অনেক রাজনৈতিক দল সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন পদ্ধতির কথা বলছেন। এই পদ্ধতিতে নির্বাচনে প্রতিটি ভোট কাজে লাগে বা মূল্যায়িত হয়। বর্তমানে পৃথিবীর ৯২টি দেশে নানা পদ্ধতিতে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের নীতি অনুসরণ করে নির্বাচন পরিচালিত হয়। এক্ষেত্রে তিনটি পদ্ধতি চালু আছে। যেমন–মুক্ত তালিকা; বদ্ধ তালিকা এবং মিশ্র তালিকা। মুক্ত তালিকায় একটি জাতীয় সংসদ বা আইনসভায় যত আসন থাকে নির্বাচনের আগে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল দল তাদের প্রার্থী তালিকা ঘোষণা করে। নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর প্রাপ্ত ভোটের হার অনুযায়ী আনুপাতিক হারে ঘোষিত তালিকার প্রথম থেকে যত আসন যে দলের ভাগে পড়বে তাঁরা সে আসনগুলো পূরণ করে নেবে। বদ্ধ তালিকায় সারা দেশের জন্য একটি তালিকা করা হয় না। অঞ্চল বিশেষ, নানা জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক তালিকা এবং ভোট ও প্রার্থী তালিকা পৃথকভাবে করা হয়। আর মিশ্র তালিকায় সংখ্যানুপাতিক ও মেজরিটারিয়ান দুই পদ্ধতির মিশ্রণ করা হয়। কিছু আসনে সংখ্যানুপাতিক এবং কিছু আসনে সরাসরি নির্বাচন হয়। যেমন–নেপাল। নেপালে নিম্ন কক্ষের মোট আসন ২৭৫। সেখানে ১৬৫ আসনে সরাসরি এবং ১১০টি আসন সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব অনুসারে পূরণ করা হয়। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, সংখ্যানুপাতিক নির্বাচন পদ্ধতির ফলে একক দলীয় আধিপত্য, অর্থ ও পেশি শক্তির প্রভাব হ্রাস পায় এবং সংখ্যাগুরুর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন হলেও সংখ্যালঘু উপেক্ষিত হয় না।

এসব নিয়ে তেমন আলোচনা না হলেও নির্বাচন আসছে এবং কীভাবে নির্বাচন হবে তা নিয়ে বিতর্কও বাড়ছে। আগামী দিনে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের চর্চা কীভাবে হবে সে বিষয়ে ভাবতে হলে নির্বাচন পদ্ধতি নিয়ে ভাবতেই হবে। কিন্তু নির্বাচনে যন্ত্রের ব্যবহার নিয়ে যত উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি নিয়ে তত ভাবনা পরিলক্ষিত হচ্ছে না। অতীতে নির্বাচন হয়েছে কিন্তু গণতান্ত্রিক প্রথা এবং প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী

হয়নি বরং দুর্বল হয়েছে, গণমানুষের আস্থা হারিয়েছে। আস্থা হারানো মানুষের আস্থা ফেরাতে এবং সংঘাত সহিংসতা এড়াতে নির্বাচন পদ্ধতির সংস্কার তাই জরুরি। এর সাথে আর একটি বিষয় কোনভাবেই ভুলে গেলে চলবে না যে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সবকিছুকে টাকার মাপে দেখার যে সংস্কৃতি চালু হয়, সমস্ত সম্পর্ক যখন অর্থনৈতিক সম্পর্কে পরিণত হয় তখন নির্বাচন কি তার বাইরে থাকতে পারে? শিক্ষা-চিকিৎসার মতো বিষয় যখন পণ্যে পরিণত হয়, তখন ভোটও প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে কেনাবেচার পণ্যে পরিণত হয় আর সংসদ পরিণত হয় ব্যবসায়ীদের ক্লাবে। ফলে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হলে শুধু নির্বাচনের পদ্ধতি নয় রাজনৈতিক পদ্ধতি পাল্টানোর সংগ্রামটা জারি রাখা প্রয়োজন।